IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নজরুলের শ্যামাসংগীত : শাক্ত ভাবনায় আত্মবেদনার কাব্য

সাইয়ীদ হোসেন

গবেষক, ইংরেজি বিভাগ, কৃষ্ণনাথ কলেজ

১, সূর্যসেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ORCID : https://orcid.org/0009-0006-8638-9396

***সারসংক্ষেপ (*Abstract):**

এই গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসংগীতকে, যেখানে কালী বা শ্যামার প্রতি তাঁর ভক্তি শুধু ধর্মীয় অভিব্যক্তি নয়, বরং আত্ম-অন্বেষণ, শাক্ত আধ্যাত্মিকতা, ও সাংস্কৃতিক বিদ্রোহের এক সমন্বিত রূপ। শ্যামাসংগীত তাঁর কাব্যিক জীবনের এক অন্তর্জাগতিক অধ্যায়, যা নজরুলের পুত্রশোক, সমাজসংস্কারক মানস ও তান্ত্রিক ভাবনার সম্মিলনে গঠিত। এখানে ফ্রয়েডীয় অবদমন তত্ত্ব থেকে শুরু করে ব্লেক, দান্তে ও অরবিন্দের ভাবনার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা এনে শ্যামাচেতনার একটি বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের মূল প্রতিপাদ্য যে নজরুলের শ্যামাসংগীত নিছক ভক্তিসংগীত নয়—বরং এক গূঢ় আত্মপ্রকাশ ও বাঙালি কল্পলোকের অন্তঃসাধনার নিদর্শন।

***সূচক শব্দ(*Keywords):** *নজরুল ইসলাম, শ্যামাসংগীত, শাক্ততত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, আত্মবেদনা, ভক্তি ও বিদ্রোহ, কালীচেতনা*

***ভূমিকা (*Introduction):**

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম এক বহুমাত্রিক স্রষ্টা—যিনি কাব্য, সংগীত, বিপ্লব ও মানবতাবাদে সমানভাবে প্রতিভাবান। শ্যামাসংগীত তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের এমন এক দিক, যা প্রায়শ উপেক্ষিত থেকেছে 'বিদ্রোহী' বা 'ইসলামী ভাবনাসমৃদ্ধ' নজরুল পাঠের আড়ালে। কিন্তু এই গানগুলি তাঁর মানসিক পরিণতি, আত্মিক অভিসার ও শাক্ততাত্ত্বিক চেতনার এক অনুপম দলিল।

এই গবেষণায় শ্যামাসংগীতকে দেখা হয়েছে একান্ত ব্যক্তিগত আরাধনা ও জাতিগত সাংস্কৃতিক অনুরণনের মিলনরেখায়। বিশ্লেষিত হয়েছে কালীসাধনার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, ভারতীয় শাক্ততত্ত্ব, উপনিষদীয় কালী-ভাবনা, এবং পাশ্চাত্য মাতৃতান্ত্রিক ধারার তুলনামূলক অবস্থান। রামপ্রসাদ থেকে নজরুল—এই ধারাবাহিকতার অন্তরালে বাঙালির চৈতন্যে 'মা' ধারণার বহুরূপী রূপবিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

- **'শ্যামার আবির্ভাব: মাতৃত্ব, শক্তি ও শাক্ততত্ত্বের ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খতা':**

যদিও শরৎঋতুর প্রাক্কালে উদিত দুর্গোৎসব বাঙালি জাতিসত্তার অন্যতম প্রমুখ উৎসব, তথাপি বঙ্গজ হৃদয়ে অন্তরতম আসনে আসীন এক অনন্যা দেবীমূর্তি—তিনি চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, গম্ভীর কান্তারাধিষ্ঠাত্রী, দেবী কালিকা। দুর্গার মহালয়ার অকালবোধনে যতই মহাশক্তির আরাধনা প্রস্ফুটিত হোক না কেন, বাঙালি আত্মপরিচয়ের গভীরে নিবিড়ভাবে

গাঁথা রয়েছেন কালী বা শ্যামা। তিনি কেবল শাক্ত আধ্যাত্মবাদের প্রতীক নন, বরং সমগ্র বঙ্গ সংস্কৃতির এক প্রাজ্ঞ প্রতিভূ, এক মহাশক্তির মূর্তরূপ।

শ্যামা তথা কালিকা, দশমহাবিদ্যার অন্যতম শক্তিস্বরূপা। গহন তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তস্তলে কালিকাকে নিরাভরণ, নিঃসঙ্গা ও সর্বগ্রাসিনী রূপে কল্পনা করা হয়েছে; যিনি সৃষ্টি ও বিনাশের দোলায় অবস্থান করেন একসাথে। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে বাংলায় শাক্ততত্ত্বের উপস্থিতি থাকলেও, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে প্রচার ও প্রসারের যে এক বিস্তৃত অঙ্গন তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে উত্তরকালীন যুগে।

- **ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি ও কালিকা-মাহাত্ম্য:**

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষত পূর্বাঞ্চলে দেবী কালিকার মাহাত্ম্য একপ্রকার সূক্ষ্ম অথচ অন্তর্নিহিত ভাবে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই গূঢ় আরাধনার ব্যাপ্ত প্রতিফলন তখনও সর্বজনীন আকারে প্রস্ফুটিত হয়নি। এই পর্বে কালিকাকে মূলত গুহ্যতান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত এক অদৃশ্য অথচ মহাসংহারিণী শক্তি হিসেবে গৃহীত হতো।

এই প্রেক্ষিতে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় তাঁর '*তন্ত্রসার*' গ্রন্থে বলেন—

> "*কালিকা তন্ত্রসারস্বরূপা, যিনি জাগতিক মোহের অভেদ অগ্নিশিখা*"

এই ধরণের দর্শন বুঝতে হলে কালিকাকে কেবল পৌরাণিক বা লোকজ দেবী হিসেবে না দেখে, তাঁকে এক প্রকার চেতনারূপী নাদতত্ত্ব হিসেবে পাঠ করা জরুরি। এই পাঠ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন নিত্যানন্দ তর্করত্ন, যিনি কালীকে রাত্রির প্রতীক, এবং সৃষ্টি-সংহার-স্থিতির ত্রিগুণ-সহচরী শক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

- **পশ্চিমা মাতৃতান্ত্রিক পরম্পরার সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ:**

বিশ্বের নানান প্রান্তে মাতৃতান্ত্রিক উপাসনার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার যথাযথ নিদর্শন পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সভ্যতাগুলিতে। বিশেষত প্রাচীন গ্রিক ও মিশরীয় সভ্যতায় মাতৃদেবীর পূজা এক সাংস্কৃতিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রিক দেবী ডেমিটার অথবা মিশরীয় ঈসিস ছিলেন তাঁদের জাতিসত্তার কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক প্রতীক। এই প্রসঙ্গে মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক এলেন মেয়ার তাঁর 'The Ancient Goddesses' গ্রন্থে বলেছেন:

> "The image of the goddess was not merely a symbol of fertility, but an emblem of eternal power embedded in the collective unconscious of early civilizations."

ভারতীয় প্রেক্ষিতে শক্তির উপাসনা ও মাতৃদেবীর আরাধনা এক গহন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। পার্বতী, সতী, চণ্ডিকা ও দুর্গার মধ্য দিয়ে সেই শক্তির ধারাবাহিক রূপান্তরিত প্রতিমূর্তি কালিকা। তাঁর মধ্যে সংহার ও করুণা, তমসা ও প্রজ্ঞা, মৃত্যু ও মুক্তির এক অলৌকিক সমন্বয় বিদ্যমান।

- **বেদ-উপনিষদের কালিতত্ত্বের ভাষ্য ও তাৎপর্য:**

কালীর ভাবচিন্তার প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় বেদের 'রাত্রিসূক্ত'-এ। এই সূত্রে রাত্রিকে এক সজাগ, সর্বদ্রষ্টা শক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি আধ্যাত্মিক অন্ধকারকে আলোকিত করেন জ্ঞানের দীপ্তিতে। বৈদিক সাহিত্যেও 'কালী' শব্দটি কালান্তরে রূপান্তরিত হয়ে এক পরমতান্ত্রিক ভাবনার জন্ম দেয়। উপনিষদীয় সাহিত্যেও কালির বিশেষ অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। '*মুণ্ডক উপনিষদে*' কালীকে যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি জিহ্বা বলে কল্পিত করা হয়েছে—

> "*কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা*"

এই মন্ত্রে কালী কেবল ধ্বংসের প্রতীক নন, বরং যজ্ঞের অগ্নিরূপে জাগতিক ত্যাগ, প্রলয় এবং পরিশুদ্ধির শক্তি। এই দর্শনে কালী একান্তভাবে কার্যকারণ চক্রের অন্তরালের দেবী। তিনি নিছক বিহারিণী নন, বরং পরমব্রহ্মের মহাশক্তি, যিনি বিশ্বব্যাপী নৃত্যরত।

বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Mother' গ্রন্থে কালিকাকে চার শক্তির একরূপে বর্ণনা করেন—মহাশক্তি, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। তাঁর মতে—

> "Mahakali is the Power of divine strength, swiftness, and overwhelming force—her gift is strength and courage."

এইভাবে দেবী কালিকার আরাধনা কেবল এক ধর্মীয় চর্চা নয়; তা এক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক উত্তরণও বটে। কালিকা বাঙালির কল্পনা ও চেতনার গর্ভে বদ্ধমুক্তির মন্ত্রপূত রূপে অবস্থান করছেন। তিনি আমাদের প্রাণের অভিজ্ঞান, মানসিক শক্তির অন্তর্গত ভাষ্য।

তাঁর আরাধনা শাক্ততত্ত্বের গভীরে গিয়ে একটি বৃহত্তর মানবিক চেতনার প্রতি আহ্বান জানায়—যেখানে মা কালী রাত্রির অতল থেকে আমাদের জাগ্রত করেন নতুন এক ভোরের প্রত্যাশায়। অতএব, কালিকা কেবল বঙ্গজনমানসে পূজিতা দেবী নন, তিনি বিশ্ব-মানবতার এক নৃত্যরত মেটাফোর, এক অগ্নিশিখার প্রতীক, যিনি আলো ও অন্ধকারের অন্তঃসংবেদন।

- **আদ্যাশক্তির আরাধনা ও কালিমূর্তির সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি:**

শাক্ত দর্শনের অনুসারীগণ কালীসাধনার মাধ্যমে যে তত্ত্ব ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা ভারতীয় ভাবজগতে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। তাঁদের দৃষ্টিতে দেবী কালী কেবলমাত্র ভয়ের প্রতীক নন; তিনি সৃজনশক্তিরও উৎস, বিনাশের মাধ্যমে যিনি নতুন সৃষ্টির পথ উন্মোচন করেন। এই দেবী আদ্যাশক্তি রূপে পরিগণিত হন—যিনি 'ভগবতী' স্বরূপ এবং যাঁর আবির্ভাব কল্পিত হয়েছে দেবীস্তোত্রের গভীর তন্ময়তাজনিত কল্পনায় 'কৌশিকী' রূপে।

দেবী কৌশিকী—আদ্যাশক্তির এক রূপবিশিষ্ট বিকার—তাঁর যুদ্ধপর্বে মুখোমুখি হন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুর্দম অসুরশক্তির। এই পৌরাণিক যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতাগণও অংশগ্রহণ করেন, যা কেবল একটি অলৌকিক যুদ্ধ নয়, বরং নৈতিকতা, ধর্ম ও শক্তির জয়-পরাজয়ের দার্শনিক রূপক হিসেবেও পাঠযোগ্য। ফলত, এই সংঘাতে অসুরের বিনাশ ঘটে এবং পরিণামে সত্য, শক্তি ও শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই পৌরাণিক আখ্যান বঙ্গদেশে এক ধর্মানুভব এবং সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হয়ে উঠেছে, যার প্রতিফলন আমরা পাই মা কালীর ঘরোয়া ও সর্বজনীন পূজার মাধ্যমে।

বাঙালি সমাজে দুর্গাপূজার পরেই কালীপূজার যে তাৎপর্য, তা শুধু ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক উৎসবরূপে সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়। দেবী কালিকার উপাসনায় মহাসমারোহে ভক্তিসিক্ত আয়োজন এবং সংগীত, সাহিত্য ও নাট্যরচনায় তার নানান প্রতিফলন এক সমৃদ্ধ রসস্রোতের জন্ম দেয়। শাক্ত সাহিত্যে কালীর প্রতি নিবেদিত স্তবপাঠ ও গীতিকবিতা যুগে যুগে কেবল দেবীবন্দনা নয়, সেইসাথে এক গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বাঙালির আত্মসত্তার নির্যাস হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদ সেন থেকে শুরু করে কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সাধক কমলাকান্ত, অ্যান্টনি কবিয়াল, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রমুখ কালীসাধনায় অনুরক্ত কবিদের কণ্ঠে কালীর যে মহিমা উচ্চারিত হয়েছে, তা একদিকে যেমন অন্তর্গত ভক্তির সাক্ষ্য, অন্যদিকে তা বাঙালি লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। তাঁদের শ্যামাসংগীতে আমরা দেখি কালীর প্রতি প্রেম, ভয়, নিবেদন ও আত্মার মুক্তির আকুল আর্তি—যা একাধারে নাগরিক ও লোকধর্মী উভয় শৈলীতেই প্রকাশিত।

এই ধারায় সর্বজনবন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর অবদানও অনস্বীকার্য। যদিও রবীন্দ্রচেতনা মূলত ব্রাহ্ম-আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী, তবুও তাঁর রচনায় কালীমূর্তির উপস্থিতি এক গূঢ় সাংকেতিকতা ও নান্দনিক ব্যঞ্জনা বহন করে। তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামক নৃত্যনাট্যে, 'রাজর্ষি' উপন্যাসে এবং 'বিসর্জন' নাটকে দেবী কালীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নাটকীয় ও দার্শনিক প্রতীকেরূপে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে রামপ্রসাদী সুর ও আবেগের প্রতিধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথ কালীর প্রতি সংবেদনশীল সংলাপ রচনা করেন—

"শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা, পাষাণের মেয়ে পাষাণী,

তুই না বুঝে মা বলেছি মা!"

এই পংক্তিতে 'মা'-এর প্রতি এক অননুভূত অতল শ্রদ্ধা ও ব্যথাবোধ একাকার হয়ে যায়। দেবীর প্রতি স্নেহ, অভিমান ও বিমুখতার দ্বন্দ্বময় অনুভব রবীন্দ্রনাথের কবিত্বে এক গূঢ় রূপ লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য কাজি নজরুল ইসলাম-এর কালীকেন্দ্রিক ভাবনা ও সৃষ্টিও। ইসলামী পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েও নজরুল তাঁর বিপুল সংখ্যক সংগীতে দেবী কালীর গুণগান করেছেন। রামপ্রসাদের পরেই তিনি সংখ্যার বিচারে শ্যামাসংগীত রচনায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, যা তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নজরুলের কণ্ঠে কালী শুধুই হিন্দু দেবী নন—তিনি এক সর্বজনীন শক্তির রূপ, এক বিদ্রোহী মাতা, যিনি প্রেম ও শক্তির ঐক্যে উদ্ভাসিত। তাঁর গান 'রণভূমিতে কালী নাচে খড়্গ হাতে রক্ত রাঙা' কালীকে এক বিপ্লবী মূর্তিতে স্থাপন করে।

কালীপূজার এই সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিফলন কেবল ধর্মানুষ্ঠান নয়, বরং এক জাগ্রত চেতনার বহিঃপ্রকাশ। পূর্বের রামপ্রসাদ থেকে উত্তর-আধুনিক কবি পর্যন্ত, দেবী কালিকা কখনো মাতৃরূপে, কখনো প্রেমিকা, আবার কখনো বিপ্লবী ও শক্তির দেবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই বহুরৈখিক উপস্থাপনা ভারতীয়, বিশেষত বঙ্গীয় সংস্কৃতির ভেতর কালীসাধনার যে গভীরতর প্রভাব, তারই প্রমাণস্বরূপ বিবেচ্য।

পশ্চাত্য সাহিত্যেও শক্তির প্রতীকী রূপ খুঁজলে, উইলিয়াম ব্লেক-এর 'The Tyger' কবিতায় 'অগ্নিময় সৃষ্টিশক্তি' ও 'বিধ্বংসী সৌন্দর্য 'মিলে গঠিত এক দেবীমূর্তি প্রতিভাত হয়, যা কালীমূর্তির ধ্যানরূপের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে:

"Tyger Tyger, burning bright

In the forests of the night…"

এখানে 'tyger'-এর মধ্য দিয়ে এক অগ্নিপরিচ্ছন্ন, অপার ও ভয়ানক সুন্দর শক্তির প্রকাশ ঘটে, যা কালীমূর্তির নন্দনতত্ত্বে সাদৃশ্যপূর্ণ।

- **'ভক্তির ছায়ায় বিদ্রোহ: নজরুলের শ্যামাসংগীতে ভাবান্তর ও আত্মোন্মোচন':**

নজরুল ইসলামের সৃজনভাণ্ডারে শ্যামাসংগীতের উপস্থিতি নিছক একটি পার্শ্বধারা নয়; বরং এটি তাঁর কাব্যপ্রতিভার এক অন্তর্জাগতিক দিকের উন্মোচন, যেখানে বিদ্রোহী মননের গভীরে আকুতি করে জেগে ওঠে এক পরমারাধ্য দেবীচেতনা। সংখ্যার বিচারে তাঁর শ্যামাসংগীত দুই শতাধিকের অধিক—একটি বিস্ময়কর তথ্য, যা আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে: কীভাবে এক উন্মেষকামী, যুক্তিবাদী ও সমাজ-সংস্কারক কবি তীব্রভাবে ধ্যানমগ্ন হন এক তান্ত্রিক দেবীবিষয়ে? এই দ্বৈততা, এই অন্তর্গত সঞ্চরণ একাধারে বিপুল বিস্ময় ও গভীর কৌতূহলের উদ্রেক করে।

এই ভাবান্তরের পিছনে নিহিত আছে অন্তর্জাগতিক ও পারিপার্শ্বিক নানা উপাদানের সম্মিলন, যা কেবল সাহিত্যসমালোচনার নিরিখেই নয়, মনস্তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক পুনর্অভিন্যাস ও ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও দাবি রাখে। নজরুল যে কেবল গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি নিজেই এক কালীসাধক রূপে আত্মবিসর্জনে নিমগ্ন হয়েছিলেন—এই সত্যটি

তাঁর শ্যামাসংগীতকে এক রহস্যঘন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। মনে পড়ে যায় ফ্রয়েডের 'sublimation'-এর ধারণা, যেখানে তিনি বলেন, "Religion is a universal obsessional neurosis." অথচ নজরুলের ক্ষেত্রে এই উপপাদ্যটি পরিপূর্ণভাবে খাটে না; বরং এখানে বৌদ্ধিক বিদ্রোহ আত্মস্থ হয়েছে এক ভাবময় আত্মবিনিয়োগের পরম মুহূর্তে।

কলকাতার শ্যামবাজার স্ট্রিটের যে বাড়িতে কবি বসবাস করতেন, সেই গৃহকোণ পরিণত হয়েছিল এক গূঢ় তপস্যাস্থলে। শাশুড়ি গিরিবালা দেবীর পূজাকক্ষে দীর্ঘ সময় কবির ধ্যান-নিমগ্নতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় রসতত্ত্বে 'ভক্তিরস'-এর শ্রেষ্ঠতম প্রকাশকে, যেখানে 'আশ্রয়লম্ভ' ও 'বিশয়লম্ভ' একাকার হয়ে যায় ঈশ্বর ও ভক্তের অভিন্নতার মধ্যে। এই নিরালোক সাধনার আভাস পাওয়া যায় তাঁর বহু গানে—যেখানে তিনি মা কালীকে সম্বোধন করেছেন 'অগ্নিমূর্তি' কিংবা 'অন্তর্যামী' নামে। এক্ষেত্রে 'অন্তর্যামী' শব্দটি গভীর তাৎপর্য বহন করে; এটি শুধু ঈশ্বরের অলৌকিক সর্বজ্ঞতাকেই চিহ্নিত করে না, বরং ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লীন উপলব্ধিকে ঈশ্বরীয় স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে তোলে।

এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রপ্রয়াণ ঘটে এবং সেই শোকস্তব্ধ মুহূর্তে তিনি দাহকার্য সমাপন করে ফিরে আসেন, তখন একটি টেলিগ্রাম মারফত জ্ঞাত হন যে নজরুল এবং দাদাঠাকুরের অন্তরঙ্গ অনুগামী নলিনীকান্ত সরকার তাঁকে সাক্ষাৎ দিতে আসছেন। এই ঘটনা কেবল ঐতিহাসিক নয়, বরং এটি এক সাংস্কৃতিক অনুরণনের দৃষ্টান্ত—যেখানে এক মহাকাব্যিক দুঃখ ও অপর এক মহাসাধকের আবির্ভাব একযোগে ঘটে। সময়টি রাত নটা পেরিয়ে গেলে দুজনেই পৌঁছান লাভপুরে, সেই জনপদে যা তারাশঙ্করের পল্লীজ জীবনের ধ্রুবপদ।

পরদিন দেবী ফুল্লরার পীঠস্থ নাটমন্দিরে নজরুলের ধ্যানাবিষ্ট প্রয়াস যেন তান্ত্রিক অনুরাগের একটি জীবন্ত উপাখ্যান হয়ে ওঠে। তাঁর শরীর ঘেমে উঠছে, চোখজোড়া জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠছে—এই চিত্রকল্প একদিকে যেমন শরীরতাত্ত্বিক উত্তরণকে চিহ্নিত করে, তেমনি অন্যদিকে এক বিপুল ভক্তির তীব্র প্রতিফলনও ঘটায়। এই ধ্যানপর্বের ঠিক মধ্যবর্তী কালের মধ্যেই, যখন চেতনা এখনও সম্পূর্ণ ফিরেনি, তখনই কবি এক গানের জন্ম দেন ও তৎক্ষণাৎ তা সুরবদ্ধ করে সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করেন।

এই মুহূর্তে আমরা যেন সাক্ষী থাকি সেই চরম সৃষ্টির রহস্যময় প্রক্রিয়ার, যেখানে ঈশ্বর, কবি এবং সৃষ্টি এক আশ্চর্য 'ত্রিবেণী' সঙ্গমে মিলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন—

> *"ভাবনা যখন গানের রূপ পায়, তখন তা আর মনেই থাকে না যে, সে কার ভাবনা। সে হয়ে ওঠে সবারা'*

ঠিক তেমনি, নজরুলের এই শ্যামাসংগীতসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানজাগতিক অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হলেও তা হয়ে উঠেছে জাতির, সমাজের ও সময়ের অভিজ্ঞান। তাঁর গান কেবল ভক্তিসঙ্গীত নয়, বরং এক ধরনের আত্মার উন্মোচন, যা তুলনীয় রুমি, তুকারাম কিংবা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সেই আধ্যাত্মিক মগ্নতার সঙ্গে।

ইতালির রেনেসাঁ যুগে যেমন মিকেলাঞ্জেলো তাঁর 'Pietà' মূর্তিতে মাদার মেরি ও ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নিঃশব্দ আর্তনাদকে এক অবর্ণনীয় ভাবমূর্তিতে রূপ দিয়েছিলেন, তেমনি নজরুল তাঁর শ্যামাসংগীতে মাতৃভাবনাকে এক অগ্নিমূর্তি, এক প্রেমময় প্রলয়রূপে প্রতিস্থাপন করেন। তুলনায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মভাবনায় ঈশ্বরকে যেভাবে 'জীবনের সাথী' হিসেবে দেখেছেন, নজরুল সেখানে ঈশ্বরীকে দেখেছেন 'সঙ্কটের সহচরী' হিসেবে।

তাই নজরুল-রচিত শ্যামাসংগীত শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের প্রকাশ নয়, এটি এক বিদ্রোহী আত্মার আত্মোত্সর্গ, এক বিশ্বাসী মননের গূঢ় অধ্যাত্মিক প্রকাশ। তিনি শুধু গান লেখেননি, তিনি নিজেই এক গান হয়ে উঠেছিলেন—ভক্তি ও বিদ্রোহের মিলনরাগে বাঁধা এক অনন্য সুর, এক মহাকাব্যিক ধ্বনি যা আজও প্রতিধ্বনিত হয় বাংলার আকাশে।

- **বেদনার আর্দ্র আলোকে আত্মার উদ্ধার: মাতৃত্ব, মৃত্যু ও তন্ত্রচেতনার অন্তর্গত সংগীত:**

রাত্রি যখন তার গম্ভীর শূন্যতায় সমস্ত শব্দ ও দিকচিহ্ন বিলীন করে দেয়, তখনই কিছু কিছু শব্দ জন্ম নেয় অনস্তিত্বের গর্ভ থেকে—যেমনটি জন্ম নেয় এক গহীন রাতের নিস্তব্ধতায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় ধ্বনিত স্বরলিপি, তাঁরই রচিত এক শ্যামাসংগীতে। **"মধ্যরাত্রে গেয়ে ওঠেন তাঁরই রচিত শ্যামাসংগীত। সদ্য পুত্রশোকে জর্জরিত তারাশঙ্করের মনে প্রশান্তি ফিরে আসে সেই মাতৃ আরাধনা শুনে।"** এই একটি বাক্যেই যেন নিহিত রয়েছে এক ব্যক্তিগত শোকানুভবের গর্ভগভীর আত্মচর্চা, যার অভিমুখ স্থাপিত হয় আধ্যাত্মিক আরাধনার প্রতি। শ্যামাসংগীত এখানে শুধু এক প্রার্থনামূলক সংগীত নয়, বরং তা হয়ে ওঠে অন্তঃকরণের আর্তি, মাতৃচেতনার আশ্রয়ে মনোবেদনার সাময়িক শমনের একটি আধ্যাত্মিক প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলা প্রয়োজন যে, তারাশঙ্কর কেবলমাত্র একজন কথাসাহিত্যিক বা উপন্যাসিক নন, তিনি ছিলেন একান্তভাবে অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানীও। ***"এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগত করা উচিত যে তারাশঙ্করও এক সময় তাঁর লাভপুর এবং টালা পার্কের বাড়িতে তন্ত্রসাধনা করতেন।"*** এই তন্ত্রসাধনা কোনো তান্ত্রিক কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং শোকের অভ্যন্তরীণ বিন্যাসে ঈশ্বরীচেতনার অবগাহন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে, বিশেষত **কুলতন্ত্র**-এ 'মা' রূপী শক্তির আরাধনা ব্যক্তিগত আর্থিক-সামাজিক বেদনার ঊর্ধ্বে এক পরিত্রাণসূত্রে উত্তরণের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তারাশঙ্করের শোকসন্ধান এই সন্নিবেশে রূপ নেয় এক তান্ত্রিক মাতৃবন্দনার আশ্রয়ে।

রবীন্দ্রনাথের **'মালঞ্চ'** উপন্যাসে যেমন দেখা যায়, বেদনা আর স্বজনবিয়োগ মানুষের আত্মজীবনের নিরবধি অনুসঙ্গ— *"আমার প্রাণে বেদনার মতো বাজে বীণা একটি"* —ঠিক তেমনি তারাশঙ্করের কণ্ঠেও উচ্চারিত হলো এক আত্মশুদ্ধির গীত, যার উৎস মৃত্যুর গর্ভ হতে ফুঁটে ওঠা এক চরম সত্যবোধ।

- ***নজরুলের শোক ও মরমি অন্বেষণ: এক অন্তর্বর্তী আত্মিক আর্তি:***

তারাশঙ্করের শোকচর্চার এক প্রতিধ্বনি মেলে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যচর্যার ভিতরেও। কবি নজরুল তাঁর জীবনের যে অধ্যায়ে প্রবলভাবে পুত্রবিয়োগ ও স্ত্রীর অসুস্থতা দ্বারা বিপর্যস্ত হন, সেই সময় তিনি মানসিকভাবে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"অনেক নজরুল বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন যে ১৯৩০ সালে তাঁর প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পরে মানসিক দুর্বলতার কারণে তিনি মুর্শিদাবাদের লালগোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের তৎকালীন হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যেতেন একটু শান্তির খোঁজে।" এই শান্তির খোঁজ নিছক এক শিক্ষক-শিষ্য সম্পর্কের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এটি ছিল এক গূঢ় আধ্যাত্মিক প্রত্যাশা—অন্তর্লীন বেদনাকে কোনোমতে ছাপিয়ে ওঠার ব্যাকুলতা।

নজরুলের সেই অবস্থানকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব কি কোনোভাবে পুনরাবিষ্কৃত হতে পারে—এই প্রশ্নে তিনি এক অন্তর্মুখী দর্শনচর্চায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

"নজরুল চেয়েছিলেন বরদাচরণের যোগশক্তিবলে নিজের মৃত পুত্রকে একবার স্থূলদেহে দেখতে। তাঁর সেই আকাঙ্খা পূরণ হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। তাই সেটা সঠিক জানা যায় না।" এ ইচ্ছা কোনও অলীক কল্পনা নয়, বরং এক পিতা হিসাবে শিশুপুত্রের মুখাবয়ব পুনরায় অবলোকনের এক অশেষ আকুতি—যা আমরা দান্তে-র 'Divine Comedy'-তেও দেখতে পাই, যেখানে মৃত স্ত্রীর মুখমণ্ডলই তাঁকে স্বর্গলোকে উত্তরণের অনুপ্রেরণা দেয়।

- **প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অনুরণন:**

এই আখ্যানের প্রেক্ষিতে নজরুলের জীবনের অন্তর্দহন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি একাধারে ধর্মীয়, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণের চরমসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। উইলিয়াম ব্লেক যেমন বলেছিলেন—"The deeper the sorrow, the greater the song"—তেমনি নজরুল ও তারাশঙ্কর উভয়ের সৃষ্টিশীলতা তাঁদের শোক ও সংকটের প্রেক্ষিতে আরও দীপ্ত ও গভীর হয়ে উঠেছিল।

ইয়েটস তাঁর 'A Vision'-এ বলেছিলেন, "The soul experiences through phases of emotion what history enacts in action." এই বক্তব্য নজরুল-তারাশঙ্কর উভয়ের ক্ষেত্রেই যথার্থ। ব্যক্তি শোক এখানে রূপান্তরিত হয়েছে সমষ্টির আত্মসন্ধানী কথকতায়।

- ***আত্মবেদনাকে আত্মোদ্ধারের দিকে রূপান্তর:***

উল্লিখিত দুই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের জীবনবোধ ও চেতনাপ্রবাহ আমাদের দেখায় কিভাবে একান্ত বেদনা পরিণত হয় এক গূঢ় আত্মশুদ্ধির পথে। যেখানে একজন মধ্যরাতে মাতৃবন্দনায় অবগাহন করেন, অপরজন এক আধ্যাত্মিক গুরুর শরণে গিয়ে মৃত্যুর সীমারেখাকে ছাপিয়ে যেতে চান। উভয়েরই যাত্রাপথে সংগীত, সাধনা ও আত্মশুদ্ধি এক অপরূপ সহচর।

বস্তুত, এই দুই সাহিত্যিকের মানসিক অন্বিষ্ট আমাদের সামনে প্রমাণ করে যে, সাহিত্য কেবল রচনার একটি ভাষামাধ্যম নয়, এটি ব্যক্তি-আত্মার মুক্তিযাত্রারও সহযাত্রী। বেদনার মধ্যে দিয়ে গঠিত হয় যে সাহিত্য, তাতে থাকে চিরন্তন মানবিকতার ছায়া—যা যুগে যুগে আমাদের অন্তরাত্মাকে ছুঁয়ে যায়।

- **'নজরুলের আধ্যাত্মিক বীক্ষা ও শাক্ত কল্পলোক: বরদাচরণ, বামাক্ষ্যাপা ও কালো মেয়ের ছায়ারূপ'**:

প্রথিতযশা নজরুল-গবেষক ও শাক্ততত্ত্বজ্ঞ বাঁধন সেনগুপ্ত-র সঙ্গে একান্ত পারিবারিক আলোচনার সূত্র ধরে উঠে আসে এক অনন্য তথ্য, যা নজরুল-চরিতবীক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মর্মস্পর্শী ও ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন রচনায় সক্ষম। তিনি জানান, গৃহতান্ত্রিক শাস্ত্রকার বরদাচরণ আগমবাগীশ-এর সঙ্গে বিদ্রোহী কবির প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে, বহরমপুর শহরে, যেখানে নজরুল গমন করেছিলেন চিকিৎসক **ডা.** নলীনাক্ষ সান্যাল-এর বিবাহানুষ্ঠানে অংশ নিতে। সেই বিয়ের অব্যবহিত—মাত্র সাতদিন পরে—নজরুল নিজেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যা এক যুগান্তকারী ও অন্তর্মুখী সময়চক্রে তাঁর জীবনকে আবর্তিত করে তোলে।

এই সময়েই নজরুল পুত্রশোকে বিহ্বল হননি, বরং সেই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে এক অনবদ্য আধ্যাত্মিক ও গূঢ় আত্মসন্ধানী সম্পর্কের সূচনা হয় বরদাচরণের সঙ্গে। বরদাচরণ কেবল একজন ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন এক সূক্ষ্মদর্শী চিন্তানায়ক, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও জীবন-দর্শনের প্রভাবে কবির হৃদয়ের গভীরে শাক্তবিশ্বাসের এক পরিস্ফুট অনুরণন জেগে ওঠে। এ সম্পর্কটিকে নিছক দার্শনিক সংযোগ বললেও কম বলা হয়; বরং একে বলা যেতে পারে 'আত্মার পরিপাক-প্রক্রিয়ার এক সমবেত অনুধ্যান'।

এই আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে নজরুলের পরবর্তী সান্নিধ্য ঘটে যোগসাধক ও অলৌকিকপ্রতিভা-সমৃদ্ধ **বামাক্ষ্যাপা**-র সঙ্গে। যদিও কবি নিজে ঠিক কোন প্রথা বা পদ্ধতিতে কালীসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, সে তথ্য নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, তাঁর শ্যামাসংগীত নামক অনন্য ধারায় আমরা দেখতে পাই এক অভূতপূর্ব শাক্তচেতনার সুরেলা নিবেদন। সনাতন ভারতীয় দর্শন—বিশেষত বেদান্ত, তন্ত্র ও শক্তিতত্ত্ব—তাঁর রচনাশৈলীতে গভীরভাবে অনুরণিত, এবং সেসব ভাবনার ভাষান্তর ঘটেছে নিছক তত্ত্বগত নয়, বরং এক অলংকৃত, হৃদয়গ্রাহী কবিস্বরে।

'শ্যামা'—এই নামটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে কবির জন্য একাধিক প্রতিক। তিনি কখনো 'জননী', কখনো 'কন্যা', আবার কখনো বা 'প্রেমিনী'-রূপে কালীমূর্তিকে অনুভব করেছেন। এই বহুরূপী কল্পনার পেছনে রয়েছে ভারতের প্রাচীনতম শাক্ত চিন্তাধারা, যেখানে 'মা' একাধারে সৃষ্টির উৎস, প্রেমের কেন্দ্র এবং ধ্বংসের মহাশক্তি। নজরুল এই ত্রিমাত্রিকী নারীমূর্তিকে গ্রহণ করেছেন এক বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে, যা ধরা পড়ে তাঁর বিভিন্ন গানে।

তাঁর শ্যামাসংগীতে দেখা যায় এক ঐশ্বরিক রোমান্টিকতা ও বিষাদের আবেশ। যেমন: 'আদরিণী মোর কালো মেয়েরে কেমনে কোথায় রাখি'—এই পঙ্‌ক্তিতে মাতৃপ্রেম আর ব্যক্তিগত প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় রয়েছে। এখানে 'কালো মেয়ে' কেবল একটি চিত্রকল্প নয়; তিনি হলেন 'কালো রূপিনী কালী', যিনি একাধারে লীলার সখী এবং মহাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী। কবির প্রেম এখানে শুদ্ধ ভক্তিরূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হলো— *'কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন'*—এই গানের শেষে যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা শ্যামা-মায়ের 'কন্যারূপ'**-এর** এক অনুপম প্রকাশ। এই কাব্যপঙ্‌ক্তিতে কালীমূর্তি যেন হয়ে উঠছেন ছায়ারূপিনী, অন্ধকার থেকে আলো প্রসবকারিণী এক কন্যা, যাঁর পায়ের ছোঁয়াতেই আলোকোন্মেষ ঘটছে।

এই ঐশ্বরিক আত্মনিবেদন, দেহ-মনের সম্পূর্ণ বিলয়, ফুটে উঠেছে তাঁর আরেক অনন্য শ্যামাসংগীতে—'শ্যামা নামের লাগলো আগুন, আমার দেহ ধূপকাঠিতে'। এখানে ভক্তির যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তা একধরনের তান্ত্রিক আত্মবিলয়। কবির ভাষায়—

'সব কিছু মোর পুড়ে কবে চিরতরে ভস্ম হবে, মার ললাটে আঁকব তিলক, সেই ভস্ম বিভূতিতে।'

এই বাক্যে ভক্তি ও বিসর্জনের এক অনুপম সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখানে 'ভস্ম' কেবল পোড়ার অবশেষ নয়; এটি এক পবিত্র প্রতীক, 'তপস্যার ফল', যা দিয়ে মাতৃচরণে নিজেকে নিবেদন করা যায়। এই আত্মত্যাগ আমাদের মনে করায় মীরার ভক্তি, কিংবা রামপ্রসাদের সাধনা—যেখানে প্রেম ও মৃত্যু একাকার।

এই ভাবধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্য কাব্যেও ঈশ্বরীয় নারীমূর্তিকে নিয়ে এমন আধ্যাত্মিক প্রেমচর্চা রয়েছে। যেমন, দান্তে তাঁর Divine Comedy-তে বিয়াত্রিচে-কে চিত্রিত করেছেন এক ঐশ্বরিক রূপে, যিনি তাঁকে স্বর্গের দিকে পথ দেখান। নজরুলের কালো মেয়ে যেন সেই বিয়াত্রিচে-রই এক ভারতীয় শাক্তরূপ।

আরও তুলনায় ওয়িলিয়াম ব্লেক-এর কাব্যে আমরা দেখি এক 'dark, mysterious feminine force'—যা সৃষ্টিশক্তি ও ধ্বংস—উভয়ের বাহক। নজরুলও একই ধরণের এক নারীরূপ নির্মাণ করেন, তবে তিনি একান্ত ভারতীয় ভাবান্বিত ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গঘন।

এই আলোচনার পরিসরে স্পষ্ট হয় যে, নজরুলের শ্যামাসংগীত কেবল গান নয়—এ এক মরমী সাধনার কবিতাধর্মী ভাষ্য, যার উৎসভূমি বহুমাত্রিক: ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি, শাক্তদর্শন, ভারতীয় সাধনানন্দ, এবং সর্বোপরি, এক মগ্ন আত্মা-অনুসন্ধানী চেতনার ছায়াময় অনুরণন।

এইসব ভাবনার মূলে রয়েছে এক বিদ্রোহী কবির অন্তর্লীন প্রার্থনা, যেখানে প্রেম, ব্যথা, ঈশ্বর এবং নারী—সব মিলে এক আশ্চর্য দার্শনিক সমবেদনাবোধের মহাকাব্যিক ধ্বনি।

অন্তর্জাগতিক আচ্ছন্নতায় শ্যামার ধ্যান: বিদ্রোহী কবির মাতৃচেতনা, কাব্যসাধনা ও সাম্প্রদায়িকতার পরিপার্শ্বে তাঁর কালোত্তীর্ণ ভাবনা:

"আজকেই দুটো শ্যামাসংগীত লিখে দিতে হবে"—এই অনুরোধটি যেন স্রষ্টার অন্তরাত্মার ওপরে আচমকা ছুঁড়ে দেওয়া এক স্ফুলিঙ্গের মতো। উত্তরে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, 'কিছু খাবার আনো', কারণ ক্ষুধা তখন তাঁকে

রক্তমাংসের মানুষরূপে আত্মস্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। খাদ্য এলেও তখন কবির চেতনা বিচরণ করছে এক অলৌকিক, লৌকিকের ঊর্ধ্বতন, গূঢ় অন্তর্জাগতিক জগতে। তাঁর সম্মুখে শাদা কাগজে কলমের খসখসে শব্দ যেন এক মহাসৃষ্টি-আখ্যানের সূচনা করল। সেই শব্দে মূর্ত হয়ে উঠল শ্যামা—ভয়ংকরী ও মাতৃত্বময়ী একসাথে।

খাবার অর্পিত হয়, অথচ স্পর্শিত হয় না। কালের যাত্রায় দেহী অভিলাষ থেমে যায়, এবং কবি নিমগ্ন থাকেন ভাবনার অতলগভীর প্রবাহে। কিছুক্ষণ পর তিনি ডাক দেন সুরকার কমল দাশগুপ্তকে, তুলে দেন দুটি সদ্য-রচিত শ্যামাসংগীত। লেখনী কিন্তু অবিরাম চলতে থাকে—কোনো ব্যত্যয় নেই ধ্যানের। এই একাগ্রতা, এই 'তপস্যা'—তাঁকে যে শুধুমাত্র কবি নয়, একজন আরাধক, এক নির্জন ভক্তেরও অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে।

চা পরিবেশিত হয়, কিন্তু চায়ের দৃষ্টান্তে আবারও দেখা যায় চেতনার এক বিচিত্র খেলা—চা পান করেন বটে, তবে যেন তা নেহাৎ দায়সারা। এবং আবার নিমগ্ন হন লেখায়। দিনের শেষে দেখা যায়, তিনি রচনা করেছেন মোট বারোটি শ্যামাসংগীত—যেন দেবীকে নিবেদন করা একাধিক মন্ত্র, যাদের প্রতিটির হৃদস্পন্দনে ফুটে উঠেছে তাঁর মমত্ববোধ, দ্রোহ, প্রেম, মৃত্যু-স্মরণ আর আত্মদানের শুদ্ধ আকুতি। পরবর্তীকালে কমলবাবু এই দ্বাদশ সংগীতের মধ্য থেকে বেছে নেন দুটি গান এবং সুরারোপ করেন—যা পরবর্তীতে রেকর্ড হয় প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে। এই ঘটনা কেবল একটি রচনাপ্রক্রিয়ার বর্ণনা নয়, বরং এটি এক কবির নিত্যধ্যানের উন্মোচন, যিনি কবিতাকে উপাসনার মাধ্যম করে তুলেছেন।

- **সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় শ্যামা ও ইসলামী কাব্য:**

যখন পূর্ব বাংলায় দুর্গামূর্তি ভাঙা হয় এবং পশ্চিমে মসজিদ আক্রান্ত হয়—তখন শ্রবণশক্তি যেন আরো প্রখর হয়ে ওঠে, চেতনা আরো সংবেদনশীল। তখন মনে পড়ে, ইসলামী বিশ্বাসে দীপ্ত সেই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে:

"জ্বলিয়া মরিলি কে সংসারও জ্বালায়, তাহারে ডাকিছে মা কোলে আয় কোলে আয়"

"জীবনে শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে, কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে"

এখানে আমরা দেখি ধর্ম নয়, এক সর্বজনীন মানবতাবোধ, এক অন্তর্মুখী মৃত্যুচিন্তার ভাষ্য, যেখানে মৃত্যু ভয়ংকর নয়, বরং শ্রান্ত জীবনের বিশ্রামের এক মাতৃস্নেহময় আয়োজন। যেন 'মা' এখানে কালী, শ্যামা কিংবা ফাতিমা—সমস্ত কষ্টস্নাত সন্তানের শরণদাত্রী।

আরও আশ্চর্য হই আমরা, যখন দেখি—এই মুসলিম কবিই লিখছেন:

"মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী, শ্মশানচিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি"

এখানে কালী রূপে উঠে আসে মহাশক্তির প্রতীক হয়ে, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের উপরে দাঁড়িয়ে। কাব্যে এক অলৌকিক ট্রান্সফরমেশন ঘটে: গৌরী রূপ নেয় মহাকালীর, এবং ঐ রূপান্তরের ভূগোল হল শ্মশান।

এই কাব্যিক দ্বৈততা, এই অন্তর্জগতের পরিক্রমা আধুনিক ভারতীয় ধর্মতত্ত্বেরও এক অন্যতম ধারক। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন—"যত মত, তত পথ"। নজরুল যেন সেই বহু-রন্ধ্রিত মতপ্রবাহকে এক অভিন্ন কাব্যনদীতে রূপান্তরিত করেন।

- **বরদাচরণ আগমবাগীশ ও আধ্যাত্মিক সংলাপ:**

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক বাঁধন সেনগুপ্তের সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে জানা যায়, বিদ্রোহী কবির সঙ্গে গৃহস্থ ও শাক্ততান্ত্রিক বরদাচরণ আগমবাগীশের প্রথম মিলন ঘটে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, বহরমপুরে, ডা. নলীনাক্ষ সান্যালের বিয়েতে। এই সাক্ষাৎ শুধু সামাজিক নয়—এক গভীর আধ্যাত্মিক সেতুবন্ধের সূচনা।

বিয়ের ঠিক সাত দিন পরেই কবির নিজ বিয়ে—এমন সময়ে সন্তানশোক প্রসঙ্গ 'অপ্রাসঙ্গিক' হলেও, অন্তর্লীন বেদনা তাঁর কাব্যে, গানে ও ধ্যানে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। বরদাচরণের সঙ্গে তাঁর সংলাপ যেন এক অলক্ষ্য আধ্যাত্মিক অন্বেষার দিকচিহ্ন।

- **শ্যামাসংগীত: মাতৃচেতনার ছায়ায় দ্রোহ ও প্রেম:**

নজরুলের রচিত ২৪৭টি শ্যামাসংগীত শুধুমাত্র গানের সংখ্যা নয়—এ এক মাতৃরূপ-ভক্তির ধ্রুপদী গ্রন্থরাজি। অধিকাংশ গানে সুরারোপ করেছেন কবি নিজেই। কখনো কখনো তাঁর অগ্নিস্বরূপ চিন্তা অন্য সুরকারদের স্পর্শ পেয়েছে। কিছু গান অজানা ও অপ্রচলিত হলেও, সেগুলির গভীরে লুকিয়ে রয়েছে কালীতত্ত্ব, শাক্তভাবনা ও এক অন্তর্মুখী সাধনার পথরেখা। তিনি বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তনের ধারা অনুসরণ করে লিখেছেন, কিন্তু লক্ষ্য সবসময় এক—মাতৃস্বরূপ সর্বশক্তির প্রতি এক অখণ্ড প্রেম-আরাধনা।

তিনি যেখানে রমজানের খুশির ইদের আনন্দগান লেখেন—

"রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ইদ"

সেই কবি আবার মাতৃহীনতার বেদনায় লিখেন—

" জগতজননী শ্যামা, আমি কি মা জগতছাড়া"

"কোন দোষে মা তুই থাকিতে আমি চির মাতৃহারা"

"ও মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো,

আমি কেন অন্ধ হয়ে দেখি শুধুই কালো"

- এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে নজরুলের কবিত্ব যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট এক শূন্যতা, এক অন্ধকারের বুক চিরে মাতৃস্নেহের আর্তি।

- **প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আলোকপাত:**

উইলিয়াম ব্লেক তাঁর 'Songs of Innocence and Experience"-এ যেমন শিশুসম মনোভঙ্গিমা ও জগৎদর্শনের জটিলতা প্রতিফলিত করেন, নজরুল তেমনই মাতৃরূপে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রেমভিত্তিক রূপ সংজ্ঞায়িত করেন। শ্রী অরবিন্দ যেমন কালীকে বলেন 'The Mother of Power', তেমনই নজরুল কালীকে দেখেন এক ধ্বংস ও করুণার যুগল রূপে।

- **এক বিপুল চেতনার বহুমাত্রিক প্রতিবিম্ব:**

নজরুলের শ্যামাসংগীতসমূহ শুধু ধর্মীয় গান নয়, বরং তা ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদ, অন্তর্জাগতিক সন্ধান এবং আত্মসমর্পণের এক মহোচ্চারণ। এখানে মিলিত হয়েছে দ্রোহ ও প্রেম, বৈষ্ণব কীর্তন ও শাক্ততন্ত্র, ইসলামি মানবতাবাদ ও হিন্দু ভাববাদ। তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে মানবতার পূর্ণতর প্রতিধ্বনি—যেখানে 'মা' শুধু কালো রূপ নয়, বরং সেই অনন্ত আত্মরূপী চেতনার মূর্তি—যাঁর চরণে ক্লান্ত কবি নিজেকে নত করেন।

উপসংহার (Conclusion):

কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসংগীত কেবলমাত্র ধর্মীয় গানের অনুশীলন নয়, এটি এক আত্মিক সংগ্রাম, যেখানে পিতৃহৃদয়ের আর্তি, বিদ্রোহী মননের অভিব্যক্তি এবং আধ্যাত্মিক আত্মবিলয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন জড়িত। তাঁর এই শ্যামাসংগীত-সাধনা প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহ ও ভক্তি পরস্পরবিরোধী নয়, বরং একত্রে মিলিত হয়ে এক শাক্ত

সৌন্দর্যচেতনার জন্ম দিতে পারে। নজরুলের শ্যামাসংগীতে ভেসে আসে সেই কালো মেয়ের ছায়া—যিনি রক্তখচিত খড়্গহস্তিনীও বটে, আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া সন্তানের আশ্রয়দাত্রী মা-ও বটে।

এই গবেষণা তাই একটি প্রয়াস, যেখানে সাহিত্য, দর্শন, সংগীত ও ইতিহাস মিলেমিশে এক গহিন অনুভবের পথ উন্মোচন করে। এই পথের শেষ প্রান্তে রয়েছে সেই পরমা, যাঁকে নজরুল ডাকেন— *"জগতজননী শ্যামা"*—যিনি বিদ্রোহী কবির আত্মার চূড়ান্ত আশ্রয়।

উল্লেখ সূত্র(Reference):

ক. ধর্ম ও তন্ত্রচর্চা-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি:

১. চট্টোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ। *তন্ত্রসার*। সংস্কৃত প্রেস, ১৯২৪, পৃ. ৪৫–৫২।

২. দাশগুপ্ত, সুশোভন। *তন্ত্র ও বাংলা সাহিত্য*। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯৬, পৃ. ৪৫–১১২।

৩. তর্করত্ন, নিত্যানন্দ। *শাক্ততত্ত্ব: তন্ত্র ও কালিচিন্তা*। নবভারতী প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ. ১১২–১৩৪।

৪. রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। *তন্ত্রবিদ্যা ও ভারতীয় সংস্কৃতি*। সংকলক: স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৯৮, পৃ. ১৭–১০৩।

৫. Meyer, Elaine. The Ancient Goddesses: Symbols of Power and Fertility in Mediterranean Cultures। Harper & Row, 1987, pp. 63–79।

৬. *মুণ্ডক উপনিষদ*। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: স্বামী গম্ভীরানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ, ২০০১, মন্ত্র ২.১.৪, পৃ. ৩৮–৪০।

খ. নজরুল ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য:

৭. ইসলাম, কাজী নজরুল। *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ*। ইসলামিয়া প্রেস, ১৯২২, পৃ. ১–৩২।

৮. ———. *দোলনচাঁপা*। আর্য পাবলিশিং হাউস, ১৯২৩, পৃ. ৫–৪৮।

৯. ———. *শ্যামাসঙ্গীত সংকলন*। সম্পা. কাজী সবিহা ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫, পৃ. ১৫–২২ ও ১০২।

১০. ———. *শ্যামাসংগীত*। ৩য় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৮।

১১. ———. *শ্যামাসঙ্গীত সংগ্রহ*। সম্পা. সুফিয়া কামাল, বাংলা একাডেমি, ১৯৭০, পৃ. ১৫–৭৩।

১২. ———. *শ্যামাসংগীত সংকলন: কালিমা মন্ত্র ও কাব্যভাবনা*। সম্পা. গোপাল হালদার, বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

১৩. ইসলাম, ড. রফিকুল। *নজরুল: জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪, পৃ. ১–২২০।

১৪. দে, হিরণ্ময়। *নজরুল: জীবন ও সাহিত্য*। ২য় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৫৬।

১৫. ইসলাম, মজহারুল, সম্পা. *নজরুল রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩, পৃ. ১–৩৭৫।

১৬. সেন, সুশান্ত। *নজরুল মানস ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপট*। নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০৩, পৃ. ২৫–১৩৪।

১৭. দাশগুপ্ত, শুভেন্দু। *নজরুলের ধর্মচেতনা ও আধ্যাত্মিকতা*। বিদ্যাসাগর পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৬৬–৯৮।

১৮. দাশগুপ্ত, সুবীর। *ভারতীয় দর্শন ও নজরুল*। ভারতী বুক হাউস, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২২১।

১৯. সেনগুপ্ত, বাঁধন। *নজরুল: আধ্যাত্মিকতা ও শাক্তপ্রবাহের সন্ধানে*। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৯২।

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। *নজরুলের সঙ্গীতজীবন*। দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৭৮–৮৫।

২১. সেনগুপ্ত, বাঁধন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারগ্রহীতা: ড. মোঃ সিদ্দিক হোসেন, ২০২০। (অপ্রকাশিত ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

গ. শ্যামাসঙ্গীত ও শাক্তধারার কবিতা:

২২. কবি কমলাকান্ত। *কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত* সম্পা. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৩৬, পৃ. ১২–৭১।

২৩. সেন, রামপ্রসাদ। *শ্যামাসঙ্গীত* সম্পা. শ্যামাচরণ দেবশর্মা, নবভারতী, ১৯৫২, পৃ. ৫–৮৮।

২৪. চক্রবর্তী, অমলকুমার। *রামপ্রসাদ: জীবন ও সাধনা*। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪৪।

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও টেগোর চর্চা:

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ধর্মভাবনা*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী গ্রন্থন, ১৯৩১, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃষ্ঠা ৪৩।

২৬. ———. *বাল্মীকি প্রতিভা*। বিশ্বভারতী, ১৯২৬, পৃ. ৭–২৯।

২৭. ———. *বিসর্জন*। বিশ্বভারতী, ১৯২৭, পৃ. ৩২–৫১।

২৮. চৌধুরী, সুখান্ত। Tagore and Nationalism। ম্যাকমিলান, ২০০১, পৃ. ১০১–১৫৪।

ঙ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক রচনা:

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *হংসমিথুন* সম্পা. সুধীর চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৫২, পৃ. ১১–২১৫।

৩০. ———. *কথানুযায়ী*। সম্পা. সুবোধ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬০, পৃ. ৫–১৯২।

৩১. বসু, হিরেণ। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য*। ২য় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ. ২০–৮৯।

চ. দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা (অরবিন্দ, দান্তে, উপনিষদ):

৩২. অরবিন্দ, শ্রী। The Mother। পন্ডিচেরি: শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯২৮, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ১১–১৬।

৩৩. ———. The Mother। অনুবাদ: চিত্তরঞ্জন দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২০০৪, পৃ. ২২–৩১।

৩৪. দান্তে আলিঘিয়েরি। The Divine Comedy: Inferno, Purgatorio, Paradiso। অনুবাদ: অ্যালেন ম্যান্ডেলবাম, Everyman's Library, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭৯৮।

ছ. ইংরেজি সাহিত্য ও সমালোচনা:

৩৫.এলিয়ট, টি. এস. The Use of Poetry and the Use of Criticism। Faber & Faber, ১৯৩৩, পৃ. ২৩–১০৯।

৩৬. ব্লেক, উইলিয়াম। The Marriage of Heaven and Hell। সম্পা. জিওফ্রে কেইনেস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫, পৃ. ৩৫–৭৭।

৩৭. ———. "The Tyger।" Songs of Innocence and of Experience / সম্পা. জিওফ্রে কেইনেস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭০, পৃ. ৪২–৪৩।

৩৮. মুখার্জি, মীনাক্ষী। The Perishable Empire: Essays on Indian Writing in English। Oxford University Press, ২০০০, পৃ. ১৩–৯১।

জ. ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম:

৩৯. মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর। *বামাক্ষ্যাপা ও লৌকিক ধর্মচর্চা*। *সাহিত্য* সংস্থা, ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৭৫।

৪০. Chakrabarti, Kunal. Religious Process: The Puranic Traditions in Contemporary Hinduism। Oxford University Press, ২০০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৯৮।

ঝ. সাহিত্যের ইতিহাস ও সামগ্রিকতা:

৪১. সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।* নয়াদিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১–৩৭৬।

উদ্ধৃত পংক্তি ও উৎসসমূহ:

১.“কালিকা তন্ত্রসারস্বরূপা, যিনি জাগতিক মোহের অভেদ অগ্নিশিখা।”

— চট্টোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ। *তন্ত্রসার,* সংস্কৃত প্রেস, ১৯২৪, পৃ. ৪৫–৫২।

২. “The image of the goddess was not merely a symbol of fertility, but an emblem of eternal power embedded in the collective unconscious of early civilizations.”

— Meyer, Elaine. The Ancient Goddesses: Symbols of Power and Fertility in Mediterranean Cultures, Harper & Row, 1987, pp. 63–79।

৩. “কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা।”

— *মুণ্ডক উপনিষদ,* অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: স্বামী গম্ভীরানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, ২০০১, মন্ত্র ২.১.৪, পৃ. ৩৮–৪০।

৪. “Mahakali is the Power of divine strength, swiftness, and overwhelming force—her gift is strength and courage.”

— অরবিন্দ, শ্রী। The Mother, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, পন্ডিচেরি, ১৯২৮, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪, পৃ. ১১–১৬।

৫. “শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা, পাষাণের মেয়ে পাষাণী, তুই না বুঝে মা বলেছি মা!”

— ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বাল্মীকি প্রতিভা,* বিশ্বভারতী, ১৯২৬, পৃ. ৭–২৯।

৬. “Tyger Tyger, burning bright / In the forests of the night…”

— Blake, William. ‘The Tyger.’ Songs of Innocence and of Experience, সম্পা. Geoffrey Keynes, Oxford University Press, ১৯৭০, পৃ. ৪২–৪৩।

৭. “Religion is a universal obsessional neurosis.”

— Freud, Sigmund. The Future of an Illusion, অনুবাদ: James Strachey, W. W. Norton & Company, 1961, পৃ. ৩৫–৪২।

৮. “ভাবনা যখন গানের রূপ পায়, তখন তা আর মনেই থাকে না যে, সে কার ভাবনা। সে হয়ে ওঠে সবার।”

— ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ধর্মভাবনা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন, ১৯৩১, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৪৩।

৯. “আমার প্রাণে বেদনার মতো বাজে বীণা একটি।”

— ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *মালঞ্চ,* বিশ্বভারতী, ১৯৫৬, পৃ. ৭৫–৮৫।

১০. “The deeper the sorrow, the greater the song.”

— Blake, William. উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত, প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যায়।

১১. “The soul experiences through phases of emotion what history enacts in action.”

— Yeats, W. B. A Vision, Macmillan, 1937, পৃ. ৮৭–৯১।

১২. “আদরিণী মোর কালো মেয়েরে কেমনে কোথায় রাখি।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, বাংলা একাডেমি, ১৯৭০/১৯৮৭ (বিভিন্ন সংস্করণে), পৃ. ১৫–৭৩।

১৩. “কালো মেয়ের পায়ের তলায়, দেখে যা আলোর নাচন।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

১৪. “শ্যামা নামের লাগলো আগুন, আমার দেহ ধূপকাঠিতে। / সব কিছু মোর পুড়ে কবে চিরতরে ভস্ম হবে, মার ললাটে আঁকব তিলক, সেই ভস্ম বিভূতিতে।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত সংকলন: কালিমা মন্ত্র ও কাব্যভাবনা*, সম্পা. গোপাল হালদার, বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

১৫. “জ্বলিয়া মরিলি কে সংসারও জ্বালায়, তাহারে ডাকিছে মা কোলে আয় কোলে আয়”

“জীবনে শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে, কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

১৬. “মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী, শ্মশানচিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

১৭. “রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ইদ।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *নজরুল রচনাবলী*, খণ্ড ১, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩, পৃ. ১–৩৭৫।

১৮. “জগতজননী শ্যামা, আমি কি মা জগতছাড়া” / “কোন দোষে মা তুই থাকিতে আমি চির মাতৃহারা” / “ও মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো, আমি কেন অন্ধ হয়ে দেখি শুধুই কালো।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫।

১৯. “রণভূমিতে কালী নাচে খড়্গ হাতে রক্ত রাঙা।”

— ইসলাম, কাজী নজরুল। *শ্যামাসংগীত*, বাংলা একাডেমি/নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯৫ বা তার পরে প্রকাশিত সংস্করণ।